বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদ

River System and Natural Resources of Bangladesh

ইউনিট ৫

ভূমিকা : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৭০০টি নদ-নদী রয়েছে। অনেক নদী শুধুমাত্র বর্ষাকালে সচল থাকলেও এগুলো জালের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, কর্ণফুলী অন্যতম। এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত সমভূমি। নদীগুলোর সাথে এখানকার মানুষের জীবনধারা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড় বড় শহর, নগর, বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি। নদীগুলো পানি ও মৎস্য সম্পদেরও অন্যতম উৎস। নদীর মতোই বনজ সম্পদ এদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের প্রধান উৎস পাহাড়ি বনভূমি, শাল ও গজারী বৃক্ষের বনভূমি এবং স্রোতজ বনভূমি। পাশাপাশি ব্যক্তি এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছে অনেক বৃক্ষ বা বনভূমি। এসব বৃক্ষ বা বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এর সাথে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। অন্যদিকে, বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। এসব খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চুনাপাথর, নুড়িপাথর, কাঁচবালি প্রভৃতি। সর্বোপরি, বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও যেটুকু সম্পদ রয়েছে সেগুলো এদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : নদী ব্যবস্থা
পাঠ-৫.২ : নদ-নদী ও জনবসতি
পাঠ-৫.৩ : পানি ও মৎস্য সম্পদ
পাঠ-৫.৪ : বনজ সম্পদ
পাঠ-৫.৫ : খনিজ সম্পদ
পাঠ-৫.৬ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব

পাঠ-৫.১ নদী ব্যবস্থা
River System

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলোর নাম বলতে পারবেন এবং
- প্রধান নদীগুলোর উৎপত্তি ও গতিপথের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, কর্ণফুলী, করতোয়া, মহানন্দা, সাঙ্গু, হালদা, ফেনী, নাফ, মাতামুহুরী।

নদী ব্যবস্থা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হিসেবে সুপরিচিত। এদেশে ছোট-বড় প্রায় ৭০০ নদ-নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার উপর এসব নদ-নদীর প্রভাব অত্যধিক। প্রধান নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, কর্ণফুলী প্রভৃতি। মূল নদীসহ শাখানদী এবং উপনদীগুলো এদেশের বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি গড়ে তুলেছে। নদীগুলো বাংলাদেশের প্রাণ হলেও বেশ কিছু নদী অনেক বছর আগেই হারিয়ে গেছে, আবার কিছু কিছু নদী হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বর্তমানে যেসব নদী রয়েছে সেগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার। নিম্নে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো বর্ণনা করা হলো (চিত্র ৫.১.১)।

পদ্মা (Padma) : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান নদী পদ্মা। এই নদী গঙ্গা নামে মধ্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এরপর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে প্রবেশ করেছে। এরপর উত্তর প্রদেশ এবং বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নামক স্থানে ভাগিরথী (বা হুগলি নদী) নামে এর একটি শাখা বের হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে, মূল গঙ্গা নদীটি রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর আরো অগ্রসর হয়ে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দের নিকট যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই দুই নদীর মিলিত স্রোত পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত মেঘনা নামে বরিশাল ও নোয়াখালী জেলা হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৩৪,১৮৮ বর্গকিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ২৩.১৭%। কুমার, ভৈরব, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ইছামতি, কপোতাক্ষ, চিত্রা পদ্মার উল্লেখযোগ্য শাখানদী এবং উত্তর দিক থেকে আগত নদীসমূহের মধ্যে মহানন্দা এর প্রধান উপনদী।

মেঘনা (Meghna) : ভারতের আসাম রাজ্যের নাগা-মনিপুর পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন বরাক নদী দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলার সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে একটি উত্তর সিলেট থেকে সুরমা নামে এবং অন্যটি দক্ষিণ সিলেট থেকে কুশিয়ারা নামে প্রবাহিত হয়ে হবিগঞ্জের কালনী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে সুরমা, কুশিয়ারা এবং কালনী নদীর মিলিত স্রোত কালনী নামে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। এরপর মেঘনা নদী কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরববাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অত:পর চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২৯,৭৮৫ বর্গকিলোমিটার। মেঘনার উপনদীসমূহের মধ্যে মনু, বাউলাই, গোমতী, তিতাস, কাসনি অন্যতম। জাঙ্গালিয়া ও ডাকাতিয়া মেঘনার শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র (Brahmaputra) : ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় পর্বতের তিব্বত অংশের মানস সরোবর থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এরপর তিব্বত হয়ে ভারতের আসাম রাজ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনা নদীর

সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদীতে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। বাংলাদেশ অংশে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রায় ২৭৭ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে। এই নদের প্রধান শাখানদী হলো বংশী ও শীতলক্ষ্যা। ধরলা ও তিস্তা প্রধান উপনদী। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উপরে উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়ে একটি নতুন স্রোতধারা সৃষ্টি হয়। যা যমুনা নামে পরিচিত।

যমুনা (Jamuna) : ১৭৮৯ সালের ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের যে শাখাটি বের হয় সেটিই বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী যমুনা। এটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়। এরপর এই মিলিত স্রোত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়েছে। যমুনার প্রধান শাখানদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা। যমুনার উপনদীগুলোর মধ্যে ধরলা, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই অন্যতম।

তিস্তা (Teesta) : ভারতের সিকিমের পাবর্ত্য অঞ্চলে তিস্তা নদী উৎপত্তি হয়েছে। এরপর অগ্রসর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার ডিমলা দিয়ে প্রবেশ করেছে। তিস্তা নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭৭ কিলেমিটার এবং চওড়া ৩০০ থেকে ৫৫০ মিটার। এ নদীতে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। যা এ অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

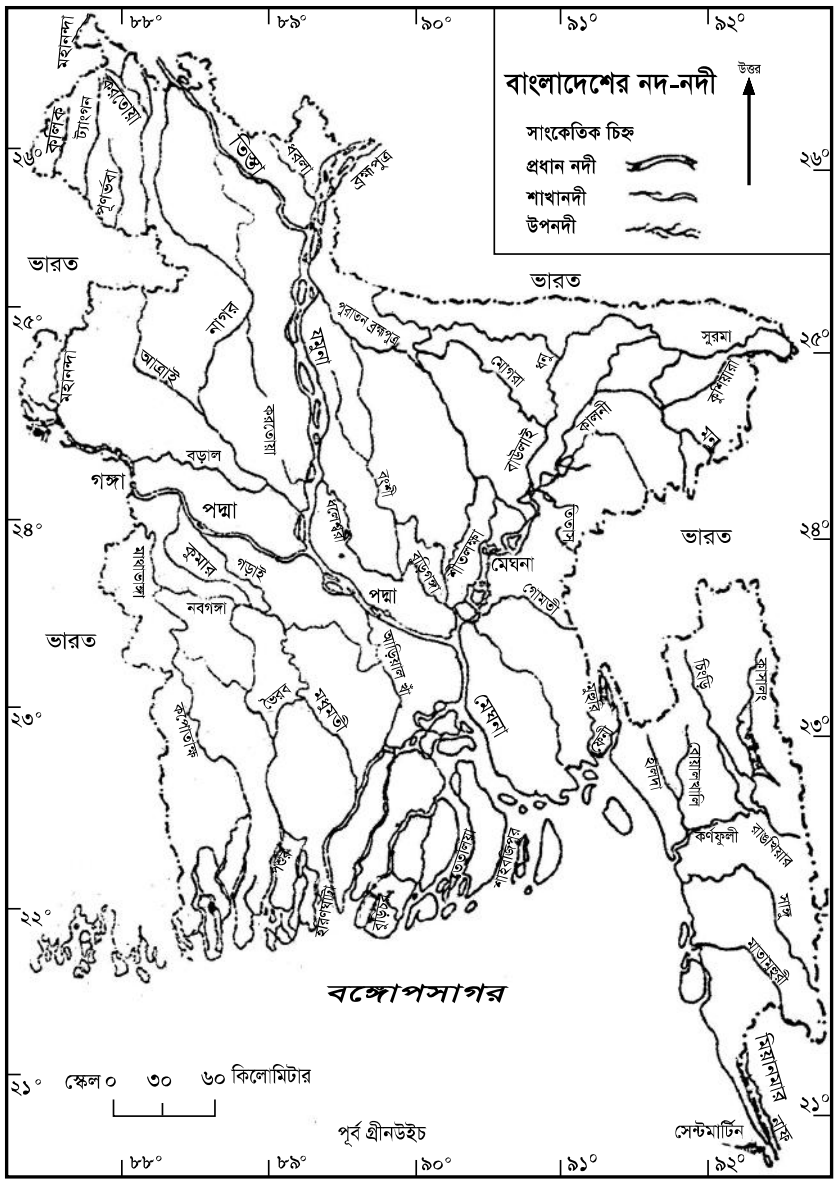

চিত্র ৫.১.১ : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা

কর্ণফুলী (Karnaphully) : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম কর্ণফুলী। এটি আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পাহাড়ি এ নদী চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার। কর্ণফুলী নদীর প্রধান উপনদী হালদা, কাসালং, বোয়ালখালি, চেঙ্গী, শিলক, রাঙখিয়াং ইত্যাদি। রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দরটি এই নদীর তীরে চট্টগ্রামে অবস্থিত।

করতোয়া (Korotoya) : ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর জলাভূমি থেকে করতোয়া নদীর উৎপত্তি। এটি পঞ্চগড় জেলার ভিটগড়ের নিকট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার নিকট আত্রাই নামে পরিচিত। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে সমাধিঘাট পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। এরপর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আবার রাজশাহী জেলার দেওয়ানপুরে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বড়াল নদীর মধ্য দিয়ে পাবনার বেড়ার নিকট যমুনায় পতিত হয়েছে। করতোয়া যমুনার দীর্ঘতম উপনদী।

মহানন্দা (Mahananda) : মহানন্দা নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দার্জিলিং জেলার নিকটবর্তী মহালড্রীম পর্বতে। এরপর জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র উত্তরের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা দিয়ে প্রবেশ করেছে। এরপর বাংলাবান্ধা থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করেছে। অত:পর ভারতের পূর্নিয়া ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাপাইনবাবগঞ্জের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করে গোদাগাড়ির কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। মহানন্দার উপনদী পুবর্ভবা, নাগর, কুলিক, ট্যাংগন, পাগলা প্রভৃতি।

সাঙ্গু (Shangu) : বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত আরাকান পাহাড় থেকে সাঙ্গু নদী উৎপত্তি হয়েছে। এরপর চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৪ কিলোমিটার।

হালদা (Haldha) : খাগড়াছড়ি জেলার বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ থেকে হালদা নদী উৎপন্ন হয়েছে। এরপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।

ফেনী (Feni) : ফেনী নদী ভারতের ত্রিপুরা পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি হয়েছে। এরপর ফেনী জেলার পূর্ব সীমানা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সন্দ্বীপ প্রণালির উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। ফেনী নদীটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক জেলা ফেনীর নামে পরিচিত।

নাফ (Knaf) : নাফ নদীর উৎপত্তি স্থল মিয়ানমার। এ নদী বাংলাদেশের টেকনাফ ও মিয়ানমার সীমানা নির্দেশ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নাফ নদীর মোহনা অত্যন্ত প্রশস্ত। উৎপত্তিস্থল থেকে বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়া পর্যন্ত এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ কিলোমিটার।

মাতামুহুরী (Matamuhuri) : মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তিস্থল লামার মাইভার পর্বত। উৎপত্তির পর উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার নিকট দিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিলোমিটার।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ছকে উল্লিখিত নদীগুলোর তথ্যগুলো পূরণ করুন।

পদের নাম	উৎপত্তি স্থল	পতিত স্থান
পদ্মা		
ব্রহ্মপুত্র		
যমুনা		
কর্ণফুলী		
মহানন্দা		
তিস্তা		

সারসংক্ষেপ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় ৭০০টি নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। যদিও অনেকগুলো নদী তার স্বাভাবিক গতিপথ এবং নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো হলো-পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি। বাংলাদেশকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে এসব নদীর বিভিন্ন শাখানদী, উপনদীগুলো এবং অন্যান্য। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতি নদীগুলোর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই নদীগুলোর স্বাভাবিক গতিপথ ধরে রেখে এর সর্বোত্তম ব্যবহার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা কতটি?

(ক) ৫০০টি (খ) ৬০০টি

(গ) ৭০০টি (ঘ) ৮০০টি

২। নাফ নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?

(ক) মিয়ানমার (খ) আসাম

(গ) ত্রিপুরা (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গা নামে একটি নদী উৎপন্ন হয়ে ভারতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে নতুন নাম ধারণ করেছে। এরপর আরো দুইটি নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীটি বাংলাদেশে কী নামে প্রবাহিত হয়েছে?

(ক) পদ্মা (খ) যমুনা

(গ) গোমতী (ঘ) মেঘনা

৪। আলোচ্য নদীটির শাখানদী হলো-

i. কুমার ii. ভৈরব

iii. মাথাভাঙ্গা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। পদ্মা-যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?

(ক) পাটুরিয়ায় (খ) গোয়ালন্দে

(গ) আরিচায় (ঘ) দৌলতদিয়ায়

পাঠ-৫.২ নদ-নদী ও জনবসতি
Rivers and Human Settlement

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নদ-নদী , জনবসতি ।

নদ-নদী ও জনবসতি

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে নদ-নদীর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে নদ-নদীর তীরবর্তী সমতল ভূমিকে আবাসস্থল হিসেবে বেঁছে নিয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোও নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন-মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, ব্যাবীলনীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা প্রভৃতি। প্রাচীনকাল থেকে নদ-নদীকেন্দ্রিক জনবসতির যে ধারা শুরু হয়েছে তা এখনো চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কেননা নদ-নদী থেকে মানুষ তার নিত্য ব্যবহার্য পানির যোগান পেয়ে থাকে। কৃষিকাজের জন্যও নদ-নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। নদ-নদীকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ মৎস্য শিকারের মাধ্যমে জীবনধারণ করে। গড়ে উঠে নদ-নদীকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নদ-নদীকেন্দ্রিক জনবসতি, নগর, বন্দর, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের নদ-নদী ও জনবসতি : আমরা পূর্বেই জেনেছি, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। দেশের প্রায় সর্বত্রই ছোট-বড় ৭০০টি নদ-নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মানুষের জীবনধারায় এসব নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের জনসংখ্যার সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছে নদ-নদীগুলোকে কেন্দ্র করে। ফলে অধিকাংশ শহর, নগর, বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে নদী তীরে। যেমন-ঢাকা শহর গড়ে উঠেছে বুড়িগঙ্গার তীরে, শীতলক্ষ্যার তীরে নারায়নগঞ্জ, কর্ণফুলীর তীরে চট্টগ্রাম, সুরমার তীরে সিলেট, পদ্মার তীরে রাজশাহী, গোমতীর তীরে কুমিল্লা, রূপসার তীরে খুলনা প্রভৃতি। নদ-নদী ও জনবসতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. বহুমুখী ব্যবহার : কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মানুষ বহুমুখী কাজে নদ-নদীকে ব্যবহার করে। খাবার পানি, রান্না-বান্না, গৃহস্থালি, গোসল, কাপড় ধোঁয়াসহ বিভিন্ন কাজে নদ-নদীর পানি ব্যবহার করে। বর্ষাকালে নদীতে বন্যার সৃষ্টি করে নদী তীরবর্তী জমিতে পলি সঞ্চিত হয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

২. যোগাযোগ ও পরিবহন : পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নদ-নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীপথে খুব সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া যায়। নদীপথে যাত্রী, ভারী মালপত্র এবং কৃষিজ, বনজ ও শিল্পজাত পণ্য সহজে এবং সুলভে বহন করা যায়।

৩. মৎস্য শিকার : নদ-নদী মৎস্যের অন্যতম উৎস। নদ-নদীতে যেসব মাছ পাওয়া যায় সেগুলো অত্যন্ত সুস্বাদু। নদী তীরবর্তী মানুষ মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। নদীতে রুই, কাতলা, বোয়াল, চিতল প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়।

৪. পানীয় জলের উৎস : শহর বা নগর এলাকার মানুষের পানীয় জলের প্রধান উৎস নদ-নদী। যেমন-ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গার পানি, রাজশাহী শহরে পদ্মার পানি, চট্টগ্রামে কর্ণফুলীর পানি, নারায়নগঞ্জে শীতলক্ষ্যা প্রভৃতি নদীর পানি পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়।

৫. শিল্প-কারখানায় পানি সরবরাহ : শিল্প-কারখানার জন্য প্রচুর পানি প্রয়োজন হয়। এ জন্য নদী তীরবর্তী এলাকায় অধিক শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হয়। এসব শিল্প-কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে জনবসতি। যেমন-মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, কর্ণফুলী প্রভৃতি নদীকে কেন্দ্র অসংখ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।

৬. কৃষিজমিতে পানি সেচ : বৃষ্টির পানি প্রকৃতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় শুকনো মৌসুমে কৃষিজমিতে পানি সেচের অন্যতম উপায় নদ-নদীর পানি। যেসব অঞ্চলে নদ-নদী রয়েছে এবং সারা বছর পানি থাকে সেগুলো থেকে নিকটবর্তী কৃষিজমিতে পানি সেচ দেওয়া যায় যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৭. নদীকেন্দ্রিক বন্দর : আমাদের দেশে নদীকেন্দ্রিক অনেকগুলো বন্দর গড়ে উঠেছে। এসব বন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বরিশাল, চাঁদপুর, আরিচা, গোয়ালন্দ, খুলনা, ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, ঝালকাঠি, মাদারীপুর, আজমিরীগঞ্জ, মোহনগঞ্জ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য অধিক উপযোগী। এসব নদীবন্দর কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত জনগণ নদী তীরে জনবসতি গড়ে তোলে।

৮. নদীকেন্দ্রিক সেচ প্রকল্প ও বাঁধ নির্মাণ : নদ-নদী তীরবর্তী জনবসতি ও কৃষির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেমন-গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প, কর্ণফুলী বহুমুখী পরিকল্পনা, ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা সেচ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ পরিকল্পনা, কুমিল্লা-চট্টগ্রাম পরিকল্পনা প্রভৃতি। এসব সেচ প্রকল্পের পানি দিয়ে কৃষি অর্থনীতি দিন দিন উন্নত হচ্ছে। মানুষের কর্মসংস্থান, বেকার সমস্যা হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে।

৯. পানি বিদ্যুৎ : নদীর স্রোতকে কেন্দ্র করে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে এরূপ একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া নদ-নদী পরিবেশ নির্মল রাখা, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বাণিজ্যের প্রসার, নৌ যোগাযোগ নিশ্চিত করাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নদ-নদীগুলোর সাথে এদেশের মানুষের গভীর সম্পর্কের নিদর্শন নদ-নদী কেন্দ্রিক জনবসতি, নগর, শহর, বন্দর প্রভৃতি। এদেশের কৃষি অর্থনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক এবং জীববৈচিত্র্যের ধারক নদ-নদী। তাই এর গুরুত্ব বিবেচনা করে দেশে প্রবাহমান নদ-নদীর নাব্যতা ধরে রেখে স্বাভাবিক গতিপথ নিশ্চিত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই নদীগুলোকে বাচিঁয়ে রাখতে হবে এবং নদীকেন্দ্রিক জনবসতিকে গতিশীল করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আশেপাশের নদ-নদীর গুরুত্ব তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নদ-নদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রাচীন সভ্যতাগুলো নদ-নদীকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশেও নদ-নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বড় বড় শহর, নগর, বন্দর প্রভৃতি। এই নদ-নদীগুলোর সাথে এদেশের মানুষের বসতি এবং জীবনযাত্রার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জনবসতির পাশাপাশি কৃষি, যাতায়াত, পরিবহন, নগর, বন্দর, শিল্প-কারখানা, পানীয়জল সরবরাহ সব কিছুতে নদ-নদী বহুভাবে প্রভাবিত করে। তাই নদ-নদীগুলোর গতিপথ ঠিক রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল কোনটিকে কেন্দ্র করে?
(ক) সাগর (খ) নদ-নদী
(গ) পার্বত্য এলাকা (ঘ) জলাভূমি

২। নদ-নদী থেকে পাওয়া যায়-
i. মৎস্য ii. সেচের পানি
iii. নৌ-যান চলাচলের সুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। রাজশাহী শহর কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে?
(ক) পদ্মা (খ) সুরমা
(গ) বুড়িগঙ্গা (ঘ) কর্ণফুলী

৪। নিচের কোনটিতে নদীবন্দর রয়েছে?
(ক) আশুগঞ্জ (খ) ভৈরববাজার
(গ) বরিশাল (ঘ) সবগুলো সঠিক

পাঠ-৫.৩ পানি ও মৎস্য সম্পদ
Water and Fish Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের পানি সম্পদের উৎসসমূহ বলতে পারবেন;
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মৎস্য সম্পদের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পানি ও মৎস্য সম্পদ ।

পানি সম্পদ

আমরা জানি, পানির অপর নাম জীবন। মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবনধারণের জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কৃষি, শিল্প, বনভূমি, শহর, নগর, গ্রাম সর্বত্র পানি প্রয়োজন। বিশ্বের সমুদয় পানি তিনটি বিশেষ অবস্থায় রয়েছে। এগুলো হলো-কঠিন (বরফ), গ্যাসীয় (জলীয়বাষ্প) এবং তরল। পানি বায়ুমন্ডলে জলীয়বাষ্প হিসেবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে কঠিন ও তরল অবস্থায় রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ পানি একটি আলোচিত বিষয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ : বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় ধরনের পানির উৎস রয়েছে। তবে এ সম্পদ সীমিত। বর্ষা মৌসুমে পানির ঘাটতি দেখা না দিলেও শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট দেখা দেয়। বাধাগ্রস্থ হয় কৃষি উৎপাদন এবং জনজীবন। বাংলাদেশের পানির অন্যতম প্রধান উৎস গ্রীষ্মকালীন ও মৌসুমী বৃষ্টিপাত এবং নদ-নদীবাহিত পানি। কিন্তু দেশের অনেক নদ-নদীর নাব্যতা সংকট এবং অপরিকল্পিতভাবে অধিক পানি ব্যবহারের কারণে শুকনো মৌসুমে অনেক নদী শুকিয়ে যায়। যা জনজীবন, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। এছাড়া বাংলাদেশের পানি সম্পদের অন্যান্য উৎসসমূহ হলো খালবিল, জলাভূমি, হাওড়, বাওড়, পুকুর, ডোবা, ভূ-গর্ভস্থ পানি, জোয়ার প্লাবিত পানি এবং অন্যান্য জলাধার।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও এর গুরুত্ব : বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত পানি শুষ্ক ও শীত মৌসুমের জন্য পরিকল্পিতভাবে ধরে রেখে এবং পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের আবশ্যকীয় এই প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। পানি ছাড়া একটি দিনও চলা যায় না। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় জন্যও পর্যাপ্ত পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশের উপর দিয়ে অনেকগুলো নদ-নদী প্রবাহিত হলেও সারা বছর অনেক নদীতে পানি থাকে না। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও তেমন কোনো জলাধার না থাকায় অন্য মৌসুমে তা ব্যবহার করা যায় না। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির পানির চাহিদা পূরণ, কৃষিজমিতে সেচ এবং অন্যান্য ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানির বহুমুখী ব্যবহারের ফলে দূষণও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আবার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি পানিকে দূষিত করছে। এছাড়া কৃষিজমিতে পানিসেচসহ দৈনন্দিন প্রয়োজনে ভূ-গর্ভ থেকে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে পানির অধিক সংকট দেখা দেওয়ার সমূহসম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে বড় বড় শহরগুলোর বিভিন্ন স্থানে গ্রীষ্ম মৌসুমে বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দেয়। দেশের অন্যান্য অনেক স্থানেও পানি সংকট দেখা যায়। এসব বিবেচনায় পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. পরিবেশ সংরক্ষণ করা;
২. পানির সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৩. নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখাসহ অন্যান্য জলাধার সংরক্ষণ করা;
৪. বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রাখার জন্য জলাধার নির্মাণ করা;
৫. পানি দূষণ প্রতিরোধ করা;
৬. উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা দূর করা;

৭. কৃষি জমিতে লবণাক্ত পানির প্রবেশ বন্ধ করা;
৮. পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার;
৯. নদীর অবৈধ দখল এবং ব্যবহার প্রতিরোধ করে স্বাভাবিক গতিপথ নিশ্চিত করা;
১০. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
১১. পানির অপচয় না করা;
১২. পানির সঠিক ব্যবহারে সবাই সচেতন হওয়া প্রভৃতি।

মৎস্য সম্পদ : বাংলাদেশ মৎস্য শিল্পে উন্নত না হলেও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। দেশের বিভিন্ন জলাশয়সমূহ মৎস্যের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। নদীপ্রধান এদেশে অসংখ্য খাল-বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর, দিঘী, ডোবাসহ বিভিন্ন জলাশয় রয়েছে। দেশের দক্ষিণে রয়েছে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। এসব উৎস থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরা হয় যা প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ পূরণ করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ৩.৬৫ শতাংশ। বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের উৎসসমূহ হলো মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য, চাষকৃত মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। সারণি ৫.৩.১ এ মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ৫.৩.১ : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস থেকে মৎস্য উৎপাদন

	মৎস্য খাতের উৎস	ধৃত মৎস্যের পরিমাণ (লক্ষ মেট্রিক টন)	শতকরা অংশ (%)
ক. মুক্ত জলাশয়	নদী ও মোহনা	১.৭৮	৪.৫৯
	সুন্দরবন	০.১৭	০.৪৪
	বিল	০.৯৩	২.৪০
	কাপ্তাই হ্রদ	০.০৮	০.২১
	প্লাবন ভূমি	৭.৪৫	১৯.২১
উপমোট		**১০.৪৬**	**২৬.৮৫**
খ. চাষকৃত	পুকুর	১৭.৩২	৪৪.৭৬
	বাওড়	০.০৮	০.২১
	অর্ধ আবদ্ধ	২.০৪	৫.২৬
	চিংড়ি খামার	২.৩৪	৬.০৪
	পেন কালচার	০.১৩	০.৩৪
	কেজ কালচার	০.০২	০.০৫
	কাকড়া	০.১৩	০.৩৪
উপমোট		**২২.০৬**	**৫৭.০০**
গ. সামুদ্রিক	ইন্ডাস্ট্রিয়াল	১.০৫	২.৭১
	আর্টিসেন্যাল	৫.২১	১৩.৪৪
উপমোট		**৬.২৭**	**১৬.১৫**
মোট		**৩৮.৭৮**	**১০০.০০**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, (পৃ .৯২)

বাংলাদেশে প্রাপ্ত মৎস্যসমূহ : বাংলাদেশে স্বাদু এবং সামুদ্রিক দুই ধরনের মৎস্যই পাওয়া যায়। স্বাদু পানির মৎস্যসমূহের মধ্যে রয়েছে কই, টাকি, মলা, শোল, খৈলসা, টেংরা, মাগুর, শিং, পুটি, রুই, কাতলা, মৃগেল, পাঙ্গাশ, গজার, কার্প জাতীয় মৎস্য প্রভৃতি। সামুদ্রিক মৎস্যসমূহের মধ্যে রয়েছে কোরাল, পোয়া, স্যামন, ছুরি, ভেটকি, চান্দা, রূপচান্দা প্রভৃতি। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ করা হয়। সারণি ৫.৩.২ এ বিগত কয়েক বছরে মৎস্যের উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ৫.৩.২ : বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন

অর্থবছর	উৎপাদিত মৎস্য (লক্ষ মেট্রিক টন)
২০১১-১২	৩২.৬২
২০১২-১৩	৩৪.১০
২০১৩-১৪	৩৫.৪৭
২০১৪-১৫	৩৬.৮৪
২০১৫-১৬	৩৮.৭৮

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭ (পৃ. ৯২)

মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব : মৎস্য প্রাণিজ আমিষের উৎস ছাড়াও জীবিকা নির্বাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, শিল্পের উপকরণ, সার প্রস্তুত, হাঁস-মুরগীর খাবার, মৎস্যভিত্তিক আনুষঙ্গিক শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সরকার মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, খাস জলাশয়ে মৎস্যজীবিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, বিল নার্সারি কার্যক্রম, মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত করা, নদ-নদীর পুন:খনন, মৎস্যের অভয়াশ্রম সৃষ্টি, মৎস্যের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, ঘের ও খাঁচায় মৎস্য চাষ বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় যেসব মৎস্য পাওয়া যায় তার তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে পানি ও মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এদেশের মানুষের দৈনন্দিন পানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, নৌ-পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বনভূমি, পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ প্রভৃতিতে পানি সম্পদ ব্যবহার করা হয়। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর, ডোবাসহ যেসব জলাশয় রয়েছে সেগুলো মৎস্য সম্পদেরও উৎস। এছাড়া দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর মৎস্য সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ আধার। এসব উৎস থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে মৎস্য আহরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে উৎপাদিত মৎস্য প্রাণিজ আমিষের ৬০ শতাংশ পূরণ করে। তাই বলা যায় যে, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রকৃতি প্রদত্ত পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশুদ্ধ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পানি কয়টি অবস্থায় থাকে?
(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

২। বাংলাদেশের পানির অন্যতম উৎস-
i. নদ-নদী ii. বৃষ্টিপাত
iii. ভূ-গর্ভ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, হাওড়, বাওড় ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। এসব জলাধার দেশের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস সরবরাহ করে যা মানব শরীরের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাণিজ আমিষের উৎসটির নাম কী?
(ক) মৎস্য (খ) ডিম (গ) মাংস (ঘ) দুধ

৪। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান কত ছিল?
(ক) ২.৬৫% (খ) ৩.৬৫% (গ) ৪.৬৫% (ঘ) ৫.৬৫%

৫। স্বাদু পানি থেকে পাওয়া যায়-
i. মাগুর ii. স্যামন
iii. শোল
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ বনজ সম্পদ
Forest Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বনভূমি ও বনজ সম্পদ কী তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বনভূমির বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বনজ সম্পদ।

বনজ সম্পদ

সাধারণভাবে বনভূমি বলতে স্বাভাবিকভাবে কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের যে অসংখ্য বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায় তাকে বুঝায়। আর বনভূমি থেকে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায় সেগুলোকে বনজ সম্পদ বলে। যে কোনো দেশ বা অঞ্চলের প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। তবে বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। বর্তমানে এদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ (বিবিএস ২০১৬)।

বনভূমির প্রকারভেদ : মৃত্তিকার গুণাগুণ এবং জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি;
২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি এবং
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার অংশবিশেষ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে এ বনভূমি অবস্থিত। পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি অবস্থিত। চিরহরিৎ বৃক্ষসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চাপালিশ, তেলসুর, ময়না প্রভৃতি। আর পাতাঝরা বা পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে গর্জন, শিমুল, কড়ই, জারুল, সেগুন উল্লেখযোগ্য। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমির মোট আয়তন প্রায় ১৫,৩২৬ বর্গ কিলোমিটার।

২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি : ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যাওয়া। তবে গ্রীষ্মকালে গাছগুলোতে আবার নতুন কচি পাতা গজায়। প্লাইস্টোসিনকালের

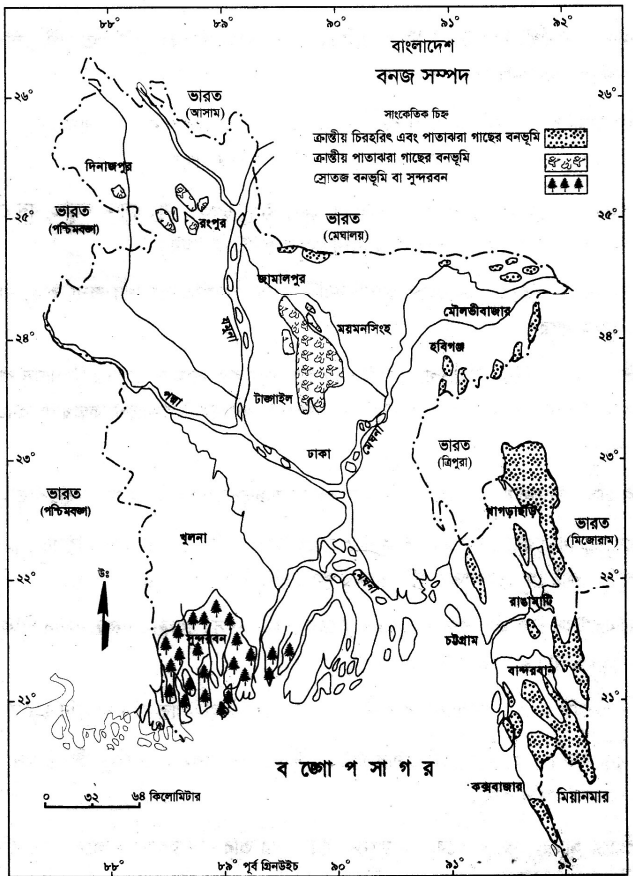

চিত্র ৫.৪.১ : বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান

সোপানসমূহে এ বনভূমির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি এবং রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বনভূমি।

ক. মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি : ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার বনভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ গজারী হওয়ায় এটি গজারী বৃক্ষের বনভূমি হিসেবে পরিচিত। এর আয়তন প্রায় ৮৭৫ বর্গকিলোমিটার।

খ. রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের বনভূমি : রংপুর ও দিনাজপুর জেলার প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে এ বনভূমি অবস্থিত। এখানকার প্রধান বৃক্ষ শাল। এজন্য এটি শাল বৃক্ষের বনভূমি হিসেবে পরিচিত। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার।

৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত ও জোয়ার-ভাটাযুক্ত পরিবেশে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জৈবনিকভাবে শুষ্ক নিবাসের উদ্ভিদই স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন নামে পরিচিত। এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী হওয়ায় এটি সুন্দরবন নামে সুপরিচিত। এটি বিশ্বের অন্যতম স্রোতজ বৃক্ষের বনভূমি। এ বনভূমি প্রায় ৬,৭৮৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বরগুনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ৯৫ বর্গকিলোমিটার ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন অন্যতম। এছাড়া সুন্দরবনে প্রচুর গোলপাতা জন্মে যা ঘরের ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উপরিউক্ত বনভূমিসমূহ ছাড়াও মিশ্র প্রকৃতির সরকারি বনভূমি, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ, সংরক্ষিত বনভূমি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) অধীনে কিছু বনভূমি, ব্যক্তি মালিকাধীন বৃক্ষ রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ ও অন্যান্য বৃক্ষ দেখা যায়।

বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদ : বনভূমি থেকে যেসব সম্পদ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম, ভেষজ ঔষধের উপকরণ, জ্বালানি কাঠসহ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের ছকের তথ্যসমূহ পূরণ করুন।

বনভূমির নাম	আয়তন	প্রধান বৃক্ষ
ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি		
ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি		
স্রোতজ বনভূমি		

সারসংক্ষেপ

বনভূমি একটি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। মৃত্তিকার গুণাগুণ এবং জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত বনভূমিসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি, ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি এবং স্রোতজ বনভূমি। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। প্লাইস্টোসিনকালের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি অবস্থিত। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এবং বরগুনা জেলায় স্রোতজ বনভূমি অবস্থিত। এসব বনভূমি থেকে কাঠ, ফলমূল, জ্বালানি, মধু, মোমসহ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য শতকরা কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
(ক) ২০ ভাগ (খ) ২৫ ভাগ
(গ) ৩০ ভাগ (ঘ) ৩৫ ভাগ

২। বাংলাদেশের বনভূমিসমূহকে কতভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) তিন (খ) চার
(গ) পাঁচ (ঘ) ছয়

৩। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি যে জেলায় অবস্থিত-
i. রাঙামাটি ii. বান্দরবান
iii. খাগড়াছড়ি
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। স্রোতজ বনভূমি বৃক্ষ -
i. সুন্দরী ii. ধুন্দল
iii. শাল
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। গজারী বৃক্ষের বনভূমি হিসেবে পরিচিত কোন বনভূমি ?
(ক) সুন্দরবন (খ) বরেন্দ্র বনভূমি
(গ) মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি (ঘ) পাহাড়ি বনভূমি

পাঠ-৫.৫ খনিজ সম্পদ
Mineral Resources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- খনিজ সম্পদ কী তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, চীনামাটি, নুড়িপাথর, খনিজ বালি।

খনিজ সম্পদ

খনিজ প্রকৃতির দান। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এক বা একাধিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোকে খনিজ বলে। ভূ-গর্ভস্থ খনি থেকে প্রাপ্ত এসব মূল্যবান সম্পদই হলো খনিজ সম্পদ। যেমন- প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, চীনামাটি, খনিজ বালি, নুড়ি পাথর ইত্যাদি।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ : বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও এখানে বেশ কিছু খনিজ রয়েছে। এসব খনিজ সম্পদ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) : জ্বালানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পূরণ করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেতের সংখ্যা ২৬টি। এর মধ্যে ২০টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে, ২টি উৎপাদনে যায়নি এবং ৪টির উৎপাদন স্থগিত রয়েছে (সারণি ৫.৫.১) । গ্যাসক্ষেত্রসমূহের উত্তোলনযোগ্য প্রাথমিক সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৭ সালের জানুয়ারি সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে ২০টি গ্যাসক্ষেত্রের ১০৯টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কূপ সংখ্যা বিবিয়ানায় ২৬টি এবং তিতাসে ২৪টি।

সারণি ৫.৫.১ : বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের নাম ও বর্তমান অবস্থা

উৎপাদনরত	উৎপাদনে এখনো যায়নি	উৎপাদন কার্যক্রম স্থগিত
তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী, মেঘনা, সিলেট, কৈলাসটিলা, রশিদপুর, বিয়ানীবাজার, সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, জালালাবাদ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা, বাঙ্গুরা।	কুতুবদিয়া, রূপগঞ্জ	সাঙ্গু, ছাতক, কামতা, ফেনী
২০টি	২টি	৪ টি

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭ (পৃ. ১৩৩)

বাংলাদেশে উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালি, চা বাগান, সিএনজি প্রভৃতি খাতে ব্যবহার করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪১.৩৩%, শিল্পে ১৬.১৩%, ক্যাপটিভে ১৬.৬৩%, গৃহস্থালিতে ১৪.৬৩%, সার কারখানায় ৫.৪৪%, সিএনজিতে ৪.৮১%, বাণিজ্যিকে ০.৯৩% এবং চা বাগানে ০.০৯% গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

খনিজ তেল (Petroleum) : বর্তমান যান্ত্রিক যুগে খনিজ তেল একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। শক্তি, তাপ এবং আলো উৎপাদনের কাজে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয়। খনিজ তেল পরিশোধন করে ডিজেল, কেরোসিন, গ্যাসোলিন, প্যারাকিন, বিটুমিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রের সপ্তম কূপে বাংলাদেশে প্রথম

তেল পাওয়া যায়। একূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে দৈনিক প্রায় ১২০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উৎপাদিত হয়। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন। বাংলাদেশের জ্বালানি তেল মজুদ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, বিপনন এবং চাহিদা অনুযায়ী আমদানির কাজ সম্পাদন করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)। অপরিশোধিত খনিজ তেল চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারী শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়।

কয়লা (Coal) : শক্তির অন্যতম প্রাকৃতিক উৎস কয়লা। তবে বাংলাদেশে উৎপাদিত কয়লা বেশির ভাগই উৎকৃষ্ট শ্রেণির নয়। এখানকার কয়লায় ছাই ও গন্ধকের পরিমাণ বেশি এবং কার্বনের পরিমাণ খুবই কম। বাংলাদেশে প্রধানত বিটুমিনাস, লিগনাইট এবং পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। কল-কারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতিতে কয়লা ব্যবহার করা হয়। দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া এবং ফুলবাড়ি উপজেলার দীঘিপাড়ায়, বগুড়ার জামালগঞ্জ, রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় কয়লাক্ষেত্র রয়েছে। দিনাজপুরের বড় পুকুড়িয়া থেকে উৎকৃষ্টমানের লিগনাইট কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে এবং এর পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন। এছাড়া ফরিদপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলাবিল, সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীটজাতীয় নিম্নমানের কয়লা এবং রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ ও সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

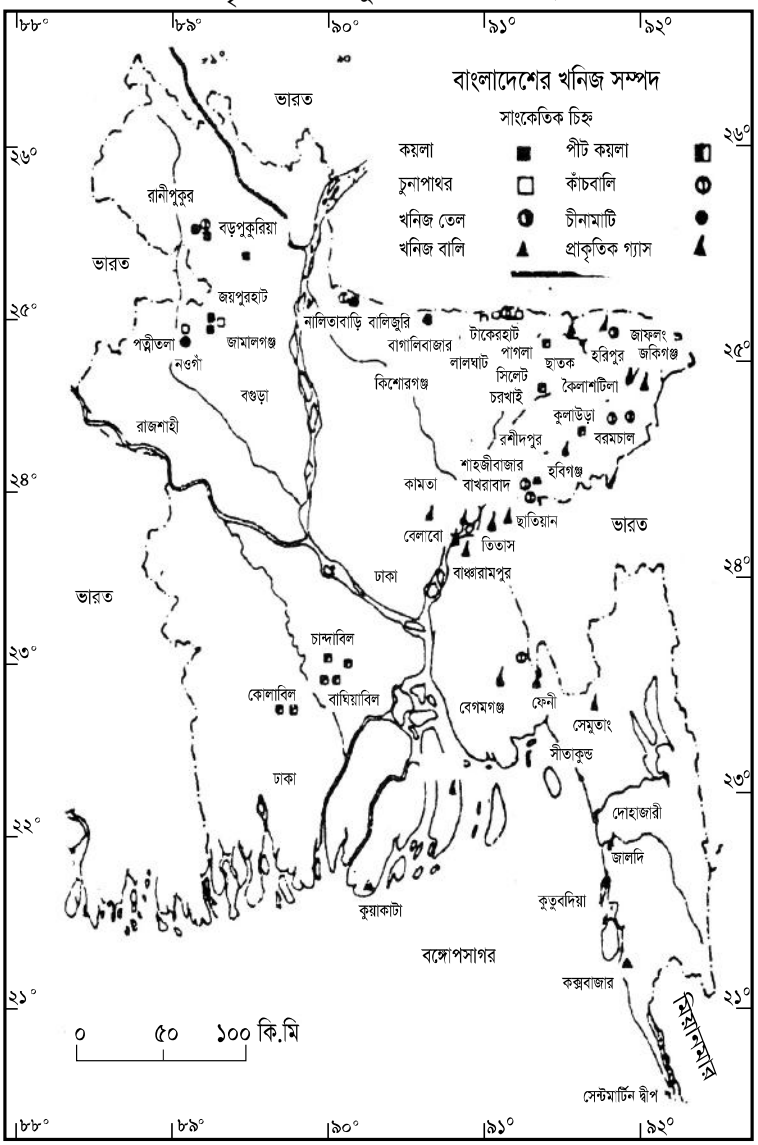

চিত্র ৫.৫.১ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

কঠিন শিলা (Hard Rock) : রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার রানীপুকুর এবং শ্যামপুরে কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুর জেলার পাবর্তীপুর উপজেলার মধ্যপাড়ায় ভূ-গর্ভের ২১২ মিটার নিচে অনুরূপ শিলা পাওয়া গেছে। বর্তমানে এ খনি থেকে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে কঠিন শিলার সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ প্রায় ১১৫ মিলিয়ন টনের অধিক। রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা ব্যবহার করা হয়।

চুনাপাথর (Limestone) : সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট, লালঘাট ও বাগলিবাজার, সিলেট জেলার জাফলং, কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন, জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় চুনাপাথর পাওয়া যায়। বাংলাদেশের চুনাপাথরের সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ১২৯ মিলিয়ন টনের অধিক। সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ্লাস, ব্লিচিং পাউডার, সাবান, কাগজ পেইন্ট প্রভৃতি শিল্পেও চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চীনামাটি (China Clay) : বাংলাদেশের ময়মনসিংহের বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে চীনামাটি পাওয়া যায়। বাসনপত্র, কাগজ, বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর, স্যানিটারি জিনিসপত্র প্রভৃতি কাজে চীনামাটি ব্যবহার করা হয়।

নুড়িপাথর (Gravel) : সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ ও পিয়ানগঞ্জ, পঞ্চগড় জেলার সদর ও তেঁতুলিয়া উপজেলা, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলা প্রভৃতি স্থানে নুড়িপাথর পাওয়া যায়। নুড়িপাথর প্রধানত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, ব্রিজ, কালভার্ট, রেলপথ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।

খনিজ বালি (Mineral Sand) : কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়। এ বালিকে তেজস্ক্রিয় বালি বলা হয়। প্রধানত ধাতব শিল্পে এ বালি ব্যবহৃত হয়।
উপরিউক্ত খনিজ সম্পদসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশে সামান্য পরিমাণে আকরিক লৌহ, গন্ধক প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পূরণ করুন।

খনিজ সম্পদের নাম	উৎপাদনকারী অঞ্চল	ব্যবহার
তেল		
কয়লা		
চুনাপাথর		
নুড়িপাথর		

সারসংক্ষেপ

যে কোনো দেশের শিল্পের উন্নয়নের জন্য খনিজ সম্পদ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রকৃতির এ সম্পদ মানুষের বহুমুখী কাজে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, চীনামাটি, নুড়িপাথর, খনিজ বালি প্রভৃতি। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ২৬টি গ্যাসক্ষেত্রে সম্ভাব্য মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১৪.৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রথম তেল আবিষ্কৃত হয়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালেও একটি তেলক্ষেত্র রয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়লা, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর, চীনামাটি, খনিজ বালি প্রভৃতি উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হওয়ায় প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ ব্যবহারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চুনাপাথর পাওয়া যায়-

i. টাকেরঘাট ii. সেন্টমার্টিন

iii. জামালগঞ্জ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। খুলনার কোলাবিল ও দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় পাওয়া যায়-

(ক) গ্যাস (খ) চুনাপাথর

(গ) কয়লা (ঘ) নুড়িপাথর

৩। নুড়িপাথর পাওয়া যায়-

i. পঞ্চগড় ii. সিলেট

iii. লালমনিরহাট

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জ্বালানির প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল। কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্পদের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে প্রতি বছর বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়।

৪। বাংলাদেশে প্রথম খনিজ তেল পাওয়া যায় কত সালে?

(ক) ১৯৮৪ সালে (খ) ১৯৮৬ সালে

(গ) ১৯৮৮ সালে (ঘ) ১৯৯০ সালে

৫। উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র হলো-

i. বাখরাবাদ ii. বরমচাল

iii. সেমুতাং

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব
Significance of Natural Resources in the Economy of Bangladesh

উদ্দেশ্য
এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–
- প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভূ-প্রকৃতি, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ ।

প্রাকৃতিক সম্পদ
প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে বুঝায়। এগুলো প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। এসব সম্পদ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি প্রদত্ত এসব সম্পদের উপরই মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে বন্টিত নয়। কোথাও সম্পদে ভরপুর আবার কোথাওবা সম্পদের পরিমাণ অপ্রতুল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। তবে এর পরিমাণ সীমিত। প্রকৃতির এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে ভূ-প্রকৃতি, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতি। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ভূ-প্রকৃতি : টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র দেশ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি গঠিত। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি বাংলাদেশকে একটি আদর্শ উর্বর কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করেছে। এসব সমতল ভূমিতে যে কোনো ফসল সহজে আবাদ করা যায়। দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলেও সাধারণ মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, উর্বর মৃত্তিকা, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারের নীতি ও সহযোগিতা বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া সমতল ভূমিতে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা দ্রুত প্রসারে সহায়তা করে। অন্যদিকে, পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ও জনজীবন কষ্টকর হলেও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার বড় বড় বৃক্ষ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি মূল্যবান কাঠ সরবরাহ করে। এছাড়া প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে সীমিত পরিসরে কৃষির পাশাপাশি মূল্যবান বৃক্ষের অন্যতম উৎস। এসব বিবেচনায় বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূ-প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বনজ সম্পদ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে বাঁশ, কাঠ, জ্বালানি, ফলমূল, মোম, মধু প্রভৃতি বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের উপকরণ যেমন- ঘরের খুটি, খাট, পালঙ্ক, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, শিল্পের কাঁচামাল, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপকরণ, পর্যটন শিল্পের উন্নতি, বেকার সমস্যা হ্রাস প্রভৃতিতে বনজ সম্পদ কাজে লাগে। কৃষির উন্নয়নে অর্থাৎ মৃত্তিকার আর্দ্রতা রক্ষা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতিরোধ, বন্যা ও সাইক্লোনের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসেও বনভূমি ভূমিকা রাখে যা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া বনভূমি থেকে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যায়। যেমন-কাগজ শিল্প,

নিউজপ্রিন্ট কারখানা, রেয়ন শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, পরিবহন তৈরি, পেন্সিল তৈরির কাঁচামাল। এছাড়া সুন্দরবনে প্রাপ্ত সম্পদ সেখানকার মানুষের জীবনধারণ এবং প্রকৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৎস্য সম্পদ : বাংলাদেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস মৎস্য। দেশের প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মৎস্য। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দেশে উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮১ শতাংশ আসে মৎস্যখাত থেকে । বাংলাদেশের মৎস্যের উৎসমূহের মধ্যে রয়েছে নদী ও মোহনা, সুন্দরবন, বিল, কাপ্তাই হ্রদ, প্লাবন ভূমি, পুকুর, হাওড়, বাওড়, অর্ধ আবদ্ধ, চিংড়ি খামার এবং দক্ষিণে অবস্থিত বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর প্রভৃতি। এদেশে স্বাদু ও লবণাক্ত উভয় পানির মৎস্য পাওয়া যায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৮২.৮২ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭)। নিম্নের ছকে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব দেখানো হলো-

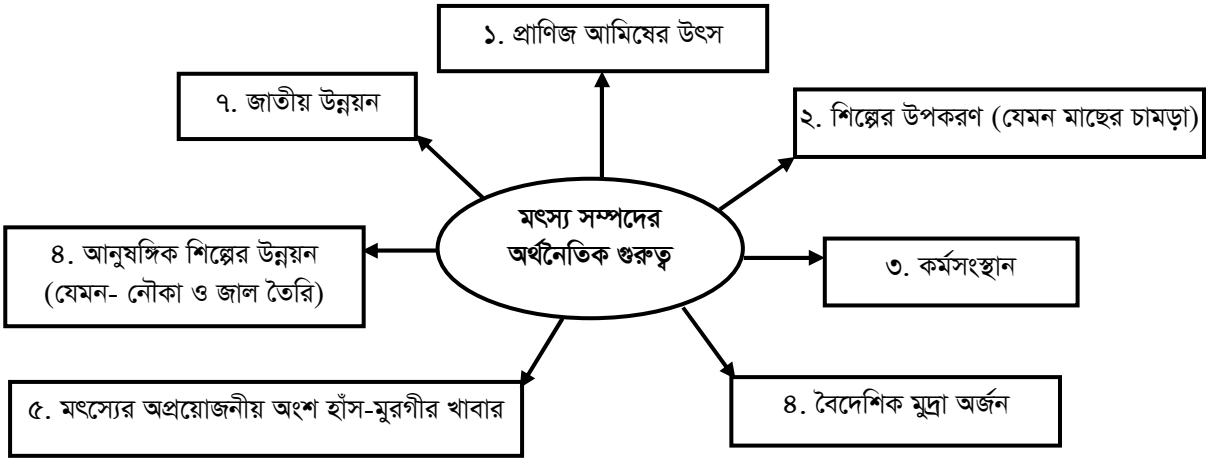

খনিজ সম্পদ : বিশ্বের যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও যেটুকু খনিজ সম্পদ রয়েছে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, নুড়িপাথর প্রভৃতি। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭১ ভাগ পূরণ করে প্রাকৃতিক গ্যাস। খনিজ তেল পরিশোধন করে ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতিতে রূপান্তর করে ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলো বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- চুনাপাথর সিমেন্ট শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কৃষি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ছাড়াও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, নদ-নদী, খালবিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। তাই এসব প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে বুঝায়। প্রকৃতির এসব সম্পদ মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকে। যেসব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে সেসব দেশ উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যায়। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয়, তবে যেসব সম্পদ রয়েছে সেগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিস্তীর্ণ ভূ-প্রকৃতি, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী প্রভৃতি। সীমিত এসব প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ হলো-
i. বনভূমি ii. ভূ-প্রকৃতি
iii. কাল-কারখানা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। বনজ সম্পদ থেকে পাওয়া যায় কোনটি ?
(ক) জ্বালানি (খ) কাঠ
(গ) ফলমূল (ঘ) সবগুলো সঠিক

৩। প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস কোনটি ?
(ক) ডিম (খ) মৎস্য
(গ) কবুতর (ঘ) ছাগল

৪। নিচের কোনটি খনিজ সম্পদ ?
(ক) কয়লা (খ) কাঠ
(গ) মোম (ঘ) মৎস্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্ন

১) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

যে কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। তদুপরি অধিক জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিনিয়ত বৃক্ষ কর্তন করা হচ্ছে। এছাড়া কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থে বৃক্ষ নিধন করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিদ্যমান বনভূমিকে সংরক্ষণ এবং নতুন বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

(ক) বনজ সম্পদ কাকে বলে? ১

(খ) বাংলাদেশের বনভূমিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? ২

(গ) বনজ সম্পদ সংরক্ষণে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ ? আপনার মতামত দিন। ৩

(ঘ) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভিন্ন ধরনের বনভূমি গড়ে উঠার কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৪

২) নিচের ছবিটি দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

(ক) খনিজ কী? ১

(খ) চুনাপাথর ও চীনামাটি কোথায় পাওয়া যায়? ২

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও বন্টন বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) বাংলাদেশের অর্থনীতেতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১ ঃ	১। গ	২। ক	৩। ক	৪। ঘ	৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২ ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। ক	৪। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩ ঃ	১। ক	২। ঘ	৩। ক	৪। খ	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪ ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ	৪। ক	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫ ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। ঘ	৪। খ	৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৬ ঃ	১। ক	২। ঘ	৩। খ	৪। ক	